বিশ্বাসের ভাইরাস

অভিজিৎ রায়

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা বিশ্ব জুড়েই আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং 'সুইসাইড টেরোরিজম'এর মাধ্যমে নির্বিচারে হত্যা এবং আতংক তৈরি ধর্মীয় উগ্রপন্থি দলগুলোর জন্য খুব জনপ্রিয় একটা পদ্ধতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কলঙ্কিত নাইন-ইলেভেন-এর কথা আমরা সবাই জানি। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আলকায়দার ১৯ জন সন্ত্রাসী চারটি যাত্রীবাহী বিমান দখল করে নেয়। তারপর বিমানগুলো কব্জা করে আমেরিকার বৃহৎ দুটি স্থাপনার ওপর ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছিল। নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর বা পেন্টাগনে ঐ হামলা চালানো হয়। প্রায় তিন হাজার আনুষ সেই হামলায় মৃত্যুবরণ করে। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা ছিলো এটি। এই হামলার পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও, এটি অনস্বীকার্য যে ১৯ জন যুবকের এই ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের পেছনে সবচেয়ে বড় মদদ আসলে বিশ্বাস নির্ভর ধর্মীয় উগ্রতা।

একটা প্রশ্ন আমাদের বরাবরই আমাকে উদ্বিগ্ন করে। কেন এই সব তরুন যুবকরা কেন আত্মঘাতী পথ বেছে নিচ্ছে? কেন তারা সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিচ্ছে? ঘটনা তো একটা দুটো নয়, সারা বিশ্ব জুড়েই ঘটে চলেছে শত শত। বাংলাদেশেই কি আমরা কিছুদিন আগে বাংলা ভাইয়ের তান্ডব দেখিনি? দেখিনি ইসলামের নামে দেশের প্রতিটি জেলায় বোমাবাজি, কিংবা রমনা বটমূলে কিংবা সিনেমা হল গুলোর মত 'বেশরিয়তী' জায়গাগুলোর উপর আগ্রাসন? দেখিনি চট্রগ্রাম আদালতে আত্মঘাতি বোমার তান্ডবে জগন্নাথ পাঁড়ের মৃত্যু? দেখিনি পত্রিকার পাতায় ঘাতকাহত হুমায়ুন আজাদের রক্তাক্ত ছবি? এগুলোর ভিত্তি কি? ২০০৫ সালের পর শুধু মুম্বাইয়েই সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেছে অন্ততঃ দশটি, যেগুলোর সাথে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে করা হয়। এর আগে আমরা রামজন্মভূমিকে ইস্যু করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সন্ত্রাস, বাবড়ি মসজিদ ধংস কিংবা গুজরাটে দাঙ্গা ও দেখেছি আমরা। এগুলোরই বা কারণ কি? এ ধরণের ঘটনা ঘটলেই খুব জোড়ে সোড়ে একটি কারণকে সামনে নিয়ে আসা হয় - বিদ্যমান সামাজিক অনাচার। ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর ১১ এর রক্তাক্ত ঘটনার পর পরই নোম চমস্কি বলেছিলেন, 'আমেরিকা নিজেই এক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, যার কর্মকান্ডই নাইন-ইলেভেনকে নিজের উপর টেনে এনেছে'[১] । তবে সব বিশ্লেষকই যে চমস্কির ঢালাও মন্তব্যের সাথে একমত হয়ছেন তা নয়। যেমন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রুস লিঙ্কন তার 'Holy Terrors, Thinking About Religion After September 11' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেছেন[২] -

> 'ধর্মের কারণেই আতা এবং তাদের অন্যান্য সহযোগীরা মনে করেছে এ ধরনের আক্রমণ শুধু নৈতিক নয়, সেই সাথে পবিত্র দায়িত্ব'।

আতা নিজেও নিজেও তার সুটকেসে কোরান বহন করছিলো । ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত আতার কাছে থেকে পাওয়া তার শেষ নির্দেশাবলীগুলোও সেই সাক্ষ্যই দেয়, যে তারা পবিত্র আল্লাহ এবং ইসলামের প্রেরণাতেই এই জিহাদে অংশ নিয়েছিলো। সেই নির্দেশবলীতে আতা খুব গুরুত্ব দিয়েই বলেছিলো - কিভাবে আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করতে হবে, কিভাবে অস্ত্র তৈরী রাখতে হবে, কিভাবে নিজের দেহকে কোরানের আয়াত দিয়ে আশীর্বাদধন্য করে নিতে হবে, কিভাবে ঘটনা ঘটানোর সময় সুরা পাঠ করে যেতে হবে ইত্যাদি[৩]।

'পবিত্র' ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রভাব সাধারণ মানুষদের কাছে ব্যাপক, এমনকি এই আধুনিক সমাজেও। সেজন্যই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর অমানবিক আয়াত কিংবা শ্লোকগুলো সন্ত্রাস এবং সহিংসতাকে উস্কে দিতে পারে। সহিংসতার সাথে যে ধর্মের বাণীর অনেক সময়ই সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে তা ব্যাখ্যা জ্যাক নেলসন প্যাল্মেয়ার দিয়েছেন তার 'ইজ রিলিজিয়ন কিলিং আস?' গ্রন্থে [৪]। তিনি বলেন,

"Violence is widely embraced because it is embedded and sanctified in sacred texts and because its use seems logical in a violent world".

একই ধরনের কথা বলেছেন নতুন দিনের নাস্তিক স্যাম হ্যারিস তার নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার 'এন্ড অব ফেইথ' গ্রন্থে[৫]। তিনি তার বইয়ে দেখিয়েছেন অতিমাত্রায় মধ্যযুগীয় বিশ্বাস নিভ্ররতার কারনেই সন্ত্রাস আর জিহাদ এখনো করাল গ্রাসের মত থাবা বসিয়ে আছে আমাদের সমাজে। তিনি মনে করেন আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরিখে মধ্যযুগীয় বিশ্বস নিভ্ররব্যবস্থা আজ অচল। এগুলো পরিত্যাগের সময় এসেছে আজ।

সন্ত্রাসের পাশাপাশি আবার আছে সামাজিক অনাচারের নানা ব্যাপার। অনেকে সময় সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক শোষণ, নির্যাতন এবং নিপীড়ন অনেক সময়ই মিলেমিশে এমনই একাকার হয়ে যায় যে আলাদা করা মুশকিলই হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যেমন হয়েছিলো, ২০০৮ সালের ২৬ এ নভেম্বর ভারতের মুম্বাইয়ে। সেইদিন প্রায় ১০ জন ফিদাইন জঙ্গী তাজ হোটেল সহ সবমিলিয়ে মুম্বাইয়ের ৫ টা বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক আক্রমন করে আখচার গোলাগুলি করে নিমেষ মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হামলায় দেড়শ জনেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিলো। ঘটনার পরপরই ডেকান মুজাহিদিন নামের একটি অজানা সন্ত্রাসী গ্রুপ ঘটনার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ লস্কর এ তৈয়বার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়[৬]। এ ছাড়াও আলকায়দা, জয়সে মুহম্মদ, ভারতীয় মুজাহিদিন এবং সর্বোপরি অন্যান্য পাকিস্তানী টেরর গ্রুপের জড়িত থাকার সম্ভাবনাও অনুমিত হয়েছে মিডিয়ায়। নিহত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাঁচজন আমেরিকান সহ পনের জন বিদেশীর মৃত্যুর ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হয়েছিলো। সিএন এন পুরো দুই-তিন দিন ধরে ভারতের ঘটনাবলী সরাসরি সম্প্রচার করে চলেছিলো। ঘটনার ভয়াবহতা এতই বেশি ছিলো যে, অনেকেই ঘটনাটিকে ভারতের ৯/১১ হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন। নাইন ইলেভেনের ঘটনার সময় যেমনটি হয়েছিলো, ঠিক তেমনি এসময়েও বহু বিশেষজ্ঞ এর পেছনে কাশ্মীর সমস্যা, সামাজিক অনাচার, মুসলিমদের প্রতি ভারতের বৈমাত্রেয় মনোভাব সহ বহু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধানে তৎপর হলেওএর পেছনে বড় একটা কারণ যে ধর্মীয় সেটাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। মূলতঃ হোটেল তাজের সেই সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামের লেখাটির সূত্রপাত ঘটেছিলো এবং এটি মুক্তমনা এবং সচলায়ন ব্লগে প্রকাশকের পর বহু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং পক্ষে বিপক্ষে আলোচনার দুয়ার উন্মোচন করেছিলো[৭]। অনেক পাঠকই 'বিশ্বাসের ভাইরাস'কে গ্রন্থাকারে রূপ দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে সসময় সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে আমার এবং রায়হান আবীরের যুগপৎ অবদানে রচিত 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটি ২০১১ সালের বইমেলায় আলোর মুখ দেখবে। বইটির প্রকাশক হবে শুদ্ধস্বর। মুক্তান্বেষার এই প্রবন্ধটি সেই প্রকাশিতব্য গ্রন্থেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

এ লেখাটির প্রেক্ষাপট মূলতঃ বিশ্বাস এবং বিশ্বাসনিভ্ররতার জৈববৈবর্তনীয় অনুসন্ধান। বিশ্বাস নিভ্রর সন্ত্রাসবাদ এত ব্যাপক আকারে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পরার পেছনে কোন নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা জীববৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা তা খুঁজে দেখাকে আমরা আসলেই জরুরী মনে করি। আসলে বিশ্বাসের ব্যাপারটি নিয়ে আমি অনেকদিন ধরেই চিন্তা করছি। বিশ্বাস কখনো একা একা পথ চলে না, বগলদাবা করে বয়ে নিয়ে বেড়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে। তাই বিশ্বাসের কথা বলতে গেলে পাশাপাশি অবধারিতভাবে ধর্মের কথাও এসে পড়ে। বিশ্বাস এবং ধর্ম অনেকসময়ই খুব পরিপূরক, আমাদের সমাজে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও। আর এ নিয়ে বহু খ্যাতনামা দার্শনিকই চিন্তাভাবনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্পিনোজা থেকে ভলতেয়ার, ফুয়েরবাক থেকে মার্ক্স পর্যন্ত অনেকেই ভেবেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মডেলও তুলে ধরা হয়েছে অনেক। বাংলা ভাষায়ও খুব বেশি না হলেও বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, লিখেছেন হুমায়ূন আজাদ, লিখেছেন আহমদ শরীফ, লিখেছেন প্রবীর ঘোষ কিংবা ভবাণীপ্রসাদ সাহু প্রমুখ। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজে এর প্রভাবকে বিশ্লেষণ করলেও আমার মতে রিচার্ড ডকিন্সের 'ভাইরাসের অব দ্য মাইণ্ড' রচনাটির আগে জৈববৈজ্ঞানিকভাবে ধর্মের মডেলকে সঠিকভাবে

বোঝা যায়নি[৩৬]। ডকিন্সের এই প্রবন্ধ থেকে অনেকটাই পরিস্কার হয়ে যায় যে,ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতি নীতিগুলো অনেকটা ফ্লু-ভাইরাসের মতোই সংক্রমিত করে। সেজন্যই ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ বহুকিছুই করে ফেলে, যা সুস্থ মস্তিস্কে কল্পনাও করা যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানের দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট ডকিন্সের এই ধারণাকেই আরো সম্প্রসারিত করে একটি বই লিখেছেন সম্প্রতি 'ব্রেকিং দ্য স্পেল' শিরোনামে । ডেরেল রে সম্প্রতি লিখেছেন 'গড ভাইরাস '। রিচার্ড ব্রডি লিখেছেন 'ভাইরাস অব দ্য মাইণ্ড' প্রভৃতি। ডকিন্স নিজেও ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপারগুলোকে মিম তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং 'সেলফিশ জিন' এবং সাম্প্রতিক 'গড ডিলুশন' বইয়ে তার সে সমস্ত ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা যতই নিজেদের যুক্তিবাদি কিংবা অবিশ্বাসী বলে দাবী করি না কেন, এটা তো অস্বীকার করার জো নেই - 'বিশ্বাসের' একটা প্রভাব সবসময়ই সমাজে বিদ্যমান ছিলো। না হলে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও প্রাচীণ ধর্মগুলো স্রেফ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে এভাবে টিকে থাকে কিভাবে? এখানেই হয়ত সামাজিক বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এটা মনে করা ভুল হবে না যে, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়তো কোন বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানব জাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় নিয়ামক। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, সাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার) - তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের এই 'যুদ্ধাংদেহী জিন' পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে। মুক্তমনা সাইটে রিচার্ড ডকিন্সের একটি চমৎকার প্রবন্ধ রাখা আছে 'ধর্মের উপযোগিতা' নামে ।প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ডকিন্স একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্বসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[৮]।

ডকিন্সের লেখাটি থেকে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যাক। মানব সভ্যতাকে ডকিন্স শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয় -এ আমরা জানি। ধরা যাক একটা শিশু চুলায় হাত দিতে গেল, ওমনি তার মা বলে উঠল - চুলায় হাত দেয় না - ওটা গরম! শিশুটা সেটা শুনে আর হাত দিল না, বরং সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিলো। মার কথা শুনতে হবে - এই বিশ্বাস পরম্পরায় আমরা বহন করি - নইলে যে আমরা টিকে থাকতে পারবো না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে - সেই ভাল মা-ই যখন অসংখ্য ভাল উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় - 'শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে', কিংবা 'রসগোল্লা খেয়ে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না' গেলে 'গোল্লা পাবে' জাতীয় - তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভাল উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দবিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় 'বিশ্বাসের ভাইরাসের'। এগুলো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। যেমন, ডাইনী পোড়ানো, সতীদাহ, বিধর্মী এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, মুরতাদদের হত্যা এগুলোর কথা বলা যায়।

বিশ্বাসের ভাইরাস

'বিশ্বাসের ভাইরাস' ব্যাপারটা এই সুযোগে আর একটু পরিস্কার করে নেয়া যাক। একটা মজার উদাহরণ দেই ডেনিয়েল ডেনেটের সাম্প্রতিক 'ব্রেকিং দ্য স্পেল' বইটি থেকে[৯]। আপনি নিশ্চয়ই ঘাসের ঝোপে কিংবা পাথরের উপরে কোন কোন পিপড়াকে দেখেছেন - সারাদিন ধরে ঘাসের নীচ থেকে ঘাসের গা বেয়ে কিংবা পাথরের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর আবার ঝুপ করে

পড়ে যায় নিচে, তারপর আবারো গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে - এই বেয়াক্কেলে কলুর বলদের মত পন্ডশ্রম করে পিপড়াটি কি এমন বাড়তি উপযোগিতা পাচ্ছে, যে এই অভ্যাসটা টিকে আছে? কোন বাড়তি উপযোগিতা না পেলে সারাদিন ধরে সে এই অর্থহীন কাজ করে সময় এবং শক্তি ব্যয় করার তো কোন মানে হয় না। আসলে সত্যি বলতে কি - এই কাজের মাধ্যমে পিপড়াটি বাড়তি কোন উপযোগিতা তো পাচ্ছেই না, বরং ব্যাপারটি সম্পুর্ণ উলটো। গবেষণায় দেখা গেছে পিপড়ার মগজে থাকা ল্যাংসেট ফ্লুক নামে এক ধরনের প্যারাসাইট এর জন্য দায়ী। এই প্যারাসাইট বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন কোন গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইট টা নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। পুরো ব্যাপারটাই এখন জলের মত পরিস্কার - যাতে পিপড়াটা কোন ভাবে গরুর পেটে ঢুকতে পারে সেই দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য ঘাস বেয়ে তার উঠা নামা। আসলে ঘাস বেয়ে উঠা নামা পিপড়ের জন্য কোন উপকার করছে না বরং ল্যাংসেট ফ্লুক কাজ করছে এক ধরনের ভাইরাস হিসবে - যার ফলশ্রুতিতে পিপড়ে বুঝে হোক, না বুঝে তার দ্বারা অযান্তেই চালিত হচ্ছে।

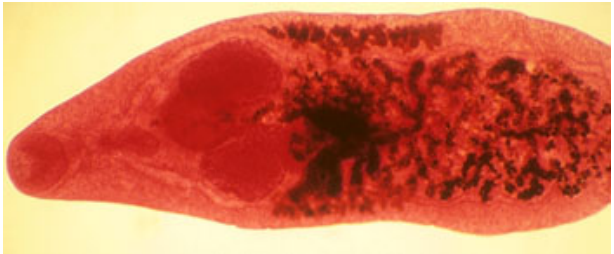

চিত্রঃ ল্যাংসেট ফ্লুক নামের প্যারাসাইটের কারণে পিপড়ের মস্তিস্ক আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন পিপড়ে কেবল চোখ বন্ধ করে পাথরের গা বেয়ে উঠা নামা করে। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও কি মানুষের জন্য একেকটি প্যারাসাইট?

এ ধরণের আরো কিছু উদাহরণ জীববিজ্ঞান থেকে হাজির করা যায়। নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম (বৈজ্ঞানিক নাম Spinochordodes tellinii) নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট আছে যা ঘাস ফড়িং-এর মস্তিস্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাস ফড়িং পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এর ফলশ্রুতিতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ামের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাস ফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে[১০]। এ ছাড়া জলাতংক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতংক রোগের জীবাণু

মস্তিস্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিস্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে উঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকেও কামড়াতে যায়। অর্থাৎ, ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আমাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা প্রথাগত বিশ্বাসের 'ভাইরাসগুলোও' কি আমাদের সময় সময় এভাবে আমাদের অযান্তেই বিপথে চালিত করে না কি? আমরা আমাদের বিশ্বাস রক্ষার জন্য প্রাণ দেই, বিধর্মীদের হত্যা করি, টুইন টাওয়ারের উপর হামলে পড়ি, সতী নারীদের পুড়িয়ে আত্মতৃপ্তি পাই, বেগানা মেয়েদের পাথর মারি। মনোবিজ্ঞানী ডেরেল রে তার 'The God Virus: How religion infects our lives and culture' বইয়ে বলেন, জলাতঙ্কের জীবাণু দেহের ভিতরে ঢুকলে যেমন মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও মানুষের চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তৈরী হয় ভাইরাস আক্রান্ত মননের। ডেরেল রে তার বইয়ে বলেন[১১] -

> 'Virtually all religion rely upon early childhood indoctrination as the prime infection strategy…Biological virus strategies bear a remarkable resemblance to method of religious propagation. Religious conversion seems to affect personally. In the viral paradigm, the God virus infects and takes over critical thinking capacity of individual with respect to his or her own religion, much as rabies affects specific parts of the central nervous system'.

নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনি ভাবে ঘাস ফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি আমরা মনে করি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদী শিক্ষা মানব সমাজে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মত সংক্রমণ ঘটিয়ে আত্মঘাতী করে তুলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর। নাইন ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশ জন ভাইরাস আক্রান্ত মনন 'ঈশ্বরের কাজ করছি ' এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিলো প্রায় তিন হাজার জন সাধারণ মানুষকে [১২]। বিগত শতকের আশির দশকে মাইকেল ব্রে নামের কুখ্যাত এক খ্রীস্টান সন্ত্রাসী ওয়াসিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়ার গর্ভপাত ক্লিনিকগুলোতে উপর বোমা হামলার পর বাইবেলের বানীকে রক্ষাকবচ হিসেবে উল্লেখ করেছিল আদালতে। হিন্দু মৌলবাবাদীরাও একসময় ভারতে রামজন্মভূমি অতিকথনের ভাইরাস বুকে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবড়ি মসজিদ। এধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে হাজির করা যাবে, ভাইরাস আক্রান্ত মনন কিভাবে কারণ হয়েছিল সভ্যতা ধ্বংসের।

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামে এক প্যারাসাইটের সংক্রমণে ঘাস ফড়িং পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে (বামে), ঠিক একইভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত আলকায়দার ১৯ জন সন্ত্রাসী যাত্রীবাহী বিমান নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলো টুইন টাওয়ারের উপর ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর (ডানে)। বিশ্বাসের ভাইরাসের বাস্তব উদাহরণ।

১১ই সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পরে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স ফ্রি এনকোয়েরি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ' Design for a Faith-Based Missile' নামে। তিনি সেই প্রবন্ধে আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের বিশ্বাস নিভ্র (ভাইরাসাক্রান্ত) মিজাইল হিসেবে অভিহিত করে লেখেন[১৩]-

> There is no doubt that the afterlife-obsessed suicidal brain really is a weapon of immense power and danger. It is comparable to a smart missile, and its guidance system is in many respects superior to the most sophisticated electronic brain that money can buy. Yet to a cynical government, organization, or priesthood, it is very very cheap.

২০১০ সালে প্রকাশিত আমার 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'-এ দেখানো হয়েছে সমকামের প্রতি অহেতুক ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরিতেও ধর্মের বিশাল ভুমিকা আছে। প্রথম দিকের প্রাচীন জনগোষ্ঠির মধ্যকার ধর্মগুলো এত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে ছিলো না বলে সমকামের প্রতি বিদ্বেষ এতো তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পর থেকেই পাদ্রী, পুরোহিত মোল্লারা ঢালাওভাবে সমকামিতাকে 'ধর্মবিরুদ্ধ যৌনাচার', 'মহাপাপ', 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিকৃতি' প্রভৃতি হিসেবে আখ্যা দিতে শুরু করে এবং এর ধারাবাহিকতায় শুরু হয় পৃথিবী জুড়ে সমকামীদের উপর লাগাতার নিগ্রহ এবং অত্যাচার[১৪] । এটাকে ভাইরাস আক্রান্ত মনন ছাড়া আর কি বলা যায়? ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে আবারো ফিরে তাকাই। ইসলামী সন্ত্রাসবাদ লালন পালনে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিশাল অবদান আছে, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু তারপরেও কেবল আমেরিকার দিকে অঙ্গুলি তুলে ধর্মগ্রন্থগুলোকে কখনোই 'ধোয়া তুলসিপাতা' বানানো যায় না। ধর্মগ্রন্থের যে অংশগুলোতে জিহাদের কথা আছে (২:২১৬, ২: ১৫৪), উদ্ভিন্নযৌবনা হুরীদের কথা আছে (৫২: ১৭-২০, ৪৪: ৫১-৫৫, ৫৬:২২), 'মুক্তা সদৃশ' গেলমান দের কথা আছে (৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) সে সমস্ত 'পবিত্র বাণী'গুলো ছোটবেলা থেকে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে কিংবা বছরের পর বছর সৌদি পেট্রোডলারে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা নামক আগাছার চাষ করে বিভিন্ন দেশে তরুণ সমাজের কিছু অংশের মধ্যে এক ধরণের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' তৈরি

করা হয়েছে; ফলে এই ভাইরাস আক্রান্ত জিহাদীরা স্বর্গের ৭২ টা হুর-পরীর আশায় নিজের বুকে বোমা বেঁধে আত্মাহূতি দিতেও আজ দ্বিধাবোধ করে না; ইহুদি, কাফের নাসারাদের হত্যা করে 'শহীদ' হতে তারা কার্পন্যবোধ করে না। ল্যাংসেট ফ্লুক প্যারাসাইটের মত তাদের মনও কেবল একটি বিশ্বাস দিয়ে চালিত - অমুসলিম কাফেরদের হত্যা করে সারা পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করতে হবে, আর পরকালে পেতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে উদ্ভিন্নযৌবণা আয়তলোচনা হুর-পরীর লোভনীয় পুরস্কার। তারা ওই ভাইরাস আক্রান্ত পিপড়ে কিংবা ঘাস ফড়িং-এর মত হামলে পড়ছে কখনো টুইন টাওয়ারে, কখনো রমনার বটমূলে কিংবা তাজ হোটেলে।

কিভাবে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে আধুনিক মিম তত্ত্বকে। মিম নামের পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৭৬ সালে, তার বিখ্যাত বই 'দ্য সেলফিশ জিন'-এ[১৫]-। আমরা তো জিন-এর কথা ইদানিং অহরহ শুনি। জিন হচ্ছে মিউটেশন, পুনর্বিন্যাস ও শরীরবৃত্তিক কাজের জন্য আমাদের ক্রোমোজমের ক্ষুদ্রতম অভিবাজ্য একক। সহজ কথায়, জিন জিনিসটা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় তথ্যের অখন্ড একক যা বংশগতীয় তথ্যকে এক প্রজন্ম থেকেপরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়। জিন যেমন আমাদের শরীরবৃত্তিয় তথ্য বংশ পরম্পরায় বহন করে, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক তথ্য বংশপরম্পরায় বহন করে নিয়ে যায় 'মিম'। কাজেই 'মিম' হচ্ছে আমাদের 'সাংস্কৃতিক তথ্যের একক', যা ক্রমিক অনুকরণ বা প্রতিলিপির মধ্যমে একজনের মন থেকে মনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যেভাবে শারীরবৃত্তীয় তথ্যের একক জিন ছড়িয়ে পড়ে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে। যে ব্যক্তি মিমটি বহন করে তাদের মিমটির 'হোস্ট' বা বাহক বলা যায়। 'মেমেপ্লেক্স' হল একসাথে বাহকের মনে অবস্থানকারী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একদল 'মিম', । কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি, কোন দেশীয় সাংস্কৃতিক বা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ -এগুলো সবই মেমেপ্লেক্সের উদাহরণ। সুসান ব্ল্যাকমোর তার 'মিম মেশিন' বইয়ে মেমেপ্লেক্সের অনেক আকর্ষনীয় উদাহরণ হাজির করেছেন। সুসান ব্ল্যাকমোর মনে করেন জিন এবং মিমের সুগ্রন্থিত সংশ্লেষই মানুষের আচার ব্যবহার, পরার্থতা, যুদ্ধাংদেহী মনোভাব, রীতি-নীতি কিংবা কুসংস্কারের অস্তিত্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। মিম নিয়ে মুক্তমনা সাইটে দিগন্ত সরকার বাংলায় চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটি রাখা আছে মুক্তমনায় প্রকাশিত ইবুক 'বিজ্ঞান ও ধর্ম : সঙ্ঘাত নাকি সম্বনয়'-এ[১৬]। এই ই-বইটিতে দিগন্ত সরকার ধর্মের উৎস সন্ধানে নামের বাংলা প্রবন্ধটিতে মিমবিন্যাসের আলোকে ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা মুলতঃ ডকিন্স এবং সুসান ব্ল্যাকমোরের মিম নিয়ে আধুনিক চিন্তাধারারই অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ[১৭]। সম্প্রতি মুক্তমনা ব্লগে ব্লগার স্বাধীন একটি চমৎকার লেখা লিখেছেন 'জিন এবং মিম' শিরোনামে[১৮]। তিনিও তার প্রবন্ধের মাধ্যমে মিমের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন বাঙালী পাঠকদের জন্য। এছাড়া অন্য বাংলা ব্লগগুলোতেও সম্প্রতি মিম নিয়ে ভাল লেখা উঠে আসছে[১৯]।

কোন সাংস্কৃতিক উপাদান কিংবা কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস কিভাবে মিমের মাধ্যমে জণপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে? মানুষের মস্তিস্ক এক্ষেত্রে আসলে কাজ করে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেভাবে কাজ করে অনেকটা সেরকমভাবে। আর মিমগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে ইন্সটল সফটওয়্যার যেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সফটওয়্যার গুলো ভালমত চলতে থাকে ততক্ষণ তা নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা থাকে না। কিন্তু কখনো কখনো কোন কোন সফটওয়্যার ভাল মানুষের (নাকি 'ভাল মিমের' বলা উচিৎ) ছদ্মবেশ নিয়ে 'ট্রোজান হর্স' হয়ে ঢুকে পড়ে। এরাই আসলে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো। এরা সূঁচ হয়ে ঢুকে, আর শেষ পর্যন্ত যেন ফাল হয়ে বেরোয়। যতক্ষণে এই ভাইরাসগুলোকে সনাক্ত করে নির্মূল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়- ততক্ষণে আমাদের হার্ডওয়্যারের দফা রফা সাড়া। এই বিশ্বাসের ভাইরাসের বলি হয়ে প্রাণ হারায় শত সহস্র মানুষ- কখনো নাইন-ইলেভেনে, কখনো বা বাবড়ি মসজিদ ধ্বংসে কখনো বা তাজ হোটেলে গোলাগুলিতে। Viruses of the Mind শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে (এ প্রবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত) অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স দেখিয়েছেন কিভাবে কম্পিউটার ভাইরাসগুলোর মতই আপাতঃ মধুর ধর্মীয় শিক্ষাগুলো কিভাবে সমাজের জন্য ট্রোজান হর্স কিংবা ওয়ার্ম ভাইরাস হিসেবে কাজ করে তিলে তিলে এর কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য পাঠকেরা পড়তে পারেন সাম্প্রতিক সময়ে রিচার্ড ব্রডির লেখা 'ভাইরাস অব মাইন্ড' নামের বইটি[২০]। এ বইটি থেকে বোঝা যায় ভাইরাস আক্রান্ত মস্তিস্ক কি শান্তভাবে রবোটের মত ধর্মের আচার আচরণগুলো নির্দ্বিধায়

পালন করে যায় দিনের পর দিন, আর কখনো সখনো বিধর্মী নিধনে উন্মত্ত হয়ে উঠে; একসময় দেখা দেয় আত্মঘাতি হামলা, জিহাদ কিংবা ক্রুসেডের মহামারী ।

ভাইরাস আক্রান্ত মনন

ভাইরাস আক্রান্ত মন-মানসিকতার উদাহরণ আমাদের চারপাশেই আছে ঢের । ব্লগ সাইটে বিতর্ক করতে গেলে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যায় । আপনি যত ভাল যুক্তি দেন না কেন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান থেকে যত আধুনিক এবং অথেন্টিক গবেষণারই উল্লেখ করুন না কেন, তারা চির আরাধ্য ধর্মগ্রন্থকে মাথায় করে রাখবেন আর আপনার প্রতি গালি গালাজের বন্যা বইয়ে দেবে । এই ধরণের অভিজ্ঞতা শুধু আমাদের নয়, ইন্টারনেটে যারা বিজ্ঞান, যুক্তিবাদিতা, সংশয়বাদিতা প্রভৃতি নিয়ে লেখালিখি করেন সেরকম অনেক লেখকদেরই আছে ।

ওই 'মডারেট' ভদ্রলোকেরা হয়ত ভাইরাস আক্রান্ত মননের খুব ছোট উদাহরণ । কিন্তু ভাইরাস আক্রান্ত মননের চরম উদাহরণগুলো হাজির করলে বোঝা যাবে কিভাবে ধরণের মানসিকতাগুলো সমাজকে পঙ্গু করে দেয়, কিংবা কিভাবে সমাজের প্রগতিকে থামিয়ে দেয় । এর অজস্র উদাহরণ সাড়া পৃথিবী জুড়ে পাওয়া যাবে । কিছু প্রাচীণ সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোন নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হত, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত - এই ধারণা থেকে যে, এটি প্রাসদের ভিত্তি মজবুত করবে । অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্যজন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমনকি খেয়েও ফেলত । কোন কোন সংস্কৃতিতে কোন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, যাতে তারা পরকালে গিয়ে পুরুষটির কাজে আসতে পারে । ফিজিতে 'ভাকাতোকা' নামে এক ধরনের বিভৎস রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই কর্তিত অংগগুলো খাওয়া হত । আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত-পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য । ভারতে সতীদাহের নামে হাজার হাজার মহিলাদের হত্যা করার কথা তো সবারই জানা । এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে । এধরনের 'ধর্মীয় হত্যা' সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য ডেভিড নিগেলের 'Human Sacrifice: In History And Today' বইটি পড়া যেতে পারে[২১] । এগুলো সবই সমাজে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামক জীবনাণুর সংক্রমনের ফলাফল ছাড়া আর কিছু নয় ।

ইতিহাসের পরতে পরতে অজস্র উদাহরণ লুকিয়ে আছে - কিভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসগুলো আনবিক বোমার মতই মরনাস্ত্র হিসেবে কাজ করে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়েছে । কিছু নমুনা দেখা যাক[২২] -

* ইতিহাসের প্রথম ক্রুসেড সংগঠিত হয়েছিলো ১০৯৫ সালে । সে সময় 'Deus Vult' (ঈশ্বরের ইচ্ছা) ধ্বনি দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে জার্মানীর রাইন ভ্যালিতে হত্যা করা হয় এবং বাস্তুচ্যুত করা হয় । জেরুজালেমের প্রায় প্রতিটি অধিবাসীকে হত্যা করা হয় শহর 'পবিত্র' করার নামে ।

* দ্বিতীয় ক্রুসেড পরিচালনার সময় সেন্ট বার্নার্ড ফতোয়া দেন, 'প্যাগানদের হত্যার মাধ্যমেই খ্রীষ্টানদের গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব' ।

* প্রাচীন আরবে 'জামালের যুদ্ধে' প্রায় দশ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছিল, তাদের আপন জ্ঞাতিভাই-মুসলিমদের দ্বারাই। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মুহম্মদ নিজেও বনি কুরাইজার ৭০০ বন্দিকে একসাথে হত্যা করেছিলেন বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

* বাইবেল থেকে (নাম্‌ব্বারস ৩১ : ১৬-১৮) জানা যায়, মুসা প্রায় এক লক্ষ লোক এবং আটষট্টি হাজার অসহায় রমনীকে হত্যা করেছিলেন , রামায়নে রাম তার তথাকথিত 'রাম রাজ্যে' শম্বুককে হত্যা করেছিলেন বেদ পাঠ করার অপরাধে।

* প্রাচীন মায়া সভ্যতায় নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিলো। অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মাথা কেটে ফেলে, হৃৎপিন্ড উপরে ফেলে, অন্ধকুপে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হত। ১৪৪৭ সালে গ্রেট পিরামিড অব টেনোখটিটলান তৈরির সময় চার দিনে প্রায় ৮০,৪০০ বন্দিকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়েছিলো। শুধু মায়া সভ্যতাতে নয় - সারা পৃথিবীতেই এ ধরনের উদাহরণ আছে। পেরুতে প্রি-ইনকা উপজাতিরা 'হাউজ অব দ্য মুন' মন্দিরে শিশুদের হত্যা করতো। তিব্বতে বন শাহমানেরা ধর্মীয় রীতির কারনে মানুষ হত্যা করতো। বোর্নিওতে বাড়ির ইমারত বানানোর আগে প্রথম গাঁথুনিটা এক কুমারীর দেহ দিয়ে প্রবেশ করানো হত - 'ভুমিদেবতা'কে তুষ্ট করার খাতিরে। প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড়রা গ্রামের ঈশ্বরের নামে মানুষ উৎসর্গ করতো। কালিভক্তরা প্রতি শুক্রবারে শিশুবলি দিত।

* তৃতীয় ক্রুসেডে রিচার্ডের আদেশে তিন হাজার বন্দিকে - যাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী এবং শিশু - জবাই করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় ক্রুসেডের সময় সেন্ট বার্ণাড ফতোয়া দিয়েছিলেন - 'প্যাগানদের হত্যার মাধ্যমেই খ্রীষ্টানদের মাহাত্ম্য সূচিত হবে। আর যীশুখ্রীষ্ট নিজেও এতে মহিমান্বিত হবেন'।

* ইসমাইলী শিয়া মুসলিমদের একটি অংশ এক সময় লুকিয়ে ছাপিয়ে বিধর্মী প্রতিপক্ষদের হত্যা করতো। এগারো থেকে তের শতক পর্যন্ত আধুনিক ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ায় বহু নেতা তাদের হাতে প্রাণ হারায়। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আরেক দস্যুদল মোঙ্গলদের হাতে তাদের উচ্ছেদ ঘটে - কিন্তু তাদের বিভৎস কীর্তি আজও অম্লান।

* কথিত আছে, এগারো শতকের শুরুর দিকে ইহুদীরা খ্রীষ্টান শিশুদের ধরে নিয়ে যেত, তারপর উৎসর্গ করে তাদের রক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতো। এই 'রক্তের মহাকাব্য' রচিত হয়েছে এমনি ধরণের শত সহস্র অমানবিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে।

* ১২০৯ সালে পোপ তৃতীয় ইনসেন্ট উত্তর ফ্রান্সের আলবীজেনসীয় খ্রিষ্টানদের উপর আক্ষরিক অর্থেই ক্রুসেড চালিয়েছিলেন। শহর দখল করার পর যখন সৈন্যরা উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিলো কিভাবে বন্দিদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসী এবং অধার্মিকদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। পোপ তখন আদেশ দিয়েছিলেন - 'সবাইকে হত্যা কর।' পোপের আদেশে প্রায় বিশ হাজার বন্দিকে চোখ বন্ধ করে ঘোড়ার পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছ্যাচরাতে ছ্যাচরাতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

* মুসলিমদের পবিত্র যুদ্ধ 'জিহাদ' উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত রক্তাক্ত করে তোলে। তারপর এই জিহাদের মড়ক প্রবেশ করে ভারতে - আর তারপর চলে যায় বলকান (ক্যাথলিক ক্রোয়েশিয়ান, অর্থডক্স সার্ব এবং মুসলিম বসনিয়ান এবং কসোভা) থেকে অস্ট্রিয়া পর্যন্ত।

* বার শতকের দিকে ইনকারা পেরুতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যে সাম্রাজ্যের পুরোধা ছিলেন একদল পুরোহিত। তারা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ২০০ শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

* ১২১৫ সালের দিকে চতুর্থ ল্যাটেরিয়ান কাউন্সিল ঘোষণা করে তাদের বিস্কুটগুলো (যড়ংঃ ধিভবৎ) নাকি অলৌকিকভাবে যীশুর দেহে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এর পর একটি গুজব রটিয়ে দেয়া হয় যে, ইহুদীরা নাকি সে সব পবিত্র বিস্কুট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এই গুজবের উপর ভিত্তি করে ১২৪৩ সালের দিকে অসংখ্য ইহুদীদের জার্মানীতে হত্যা করা হয়। একটি রিপোর্টে দেখা যায় ছয় মাসে ১৪৬ জন ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছিলো। এই 'পবিত্র হত্যাযজ্ঞ' চলতে থাকে প্রায় ১৮ শতক পর্যন্ত।

* বার শতকের দিকে সাড়া ইউরোপ জুড়ে আলবেজেনসীয় ধর্মদ্রোহীদের খুঁজে খুঁজে হত্যার রীতি চালু হয়। ধর্মদ্রোহীদের কখনো পুড়িয়ে, কখনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে কখনো বা শিরোচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট এই সমস্ত হত্যায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কথিত আছে ধর্মবিচরণ সভার সংবীক্ষক (Inquisitor) রবার্ট লী বোর্জে এক সপ্তাহে ১৮৩ জন ধর্মদ্রোহীকে হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

* বহু লোক সে সময় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ধর্মত্যাগ করেন, কিন্তু সে সমস্ত ধর্মত্যাগীদের পুরোনো ধর্মের অবমাননার অজুহাতে হত্যার আদেশ দেয়া হয়। স্পেনে প্রায় ২০০০ ধর্মত্যাগীদের পুড়িয়ে মারা হয়। কেউ কেউ ধর্মত্যাগ না করলেও ধর্মের অবমাননার অজুহাতে পোড়ানো হয়। জিওর্দানো ব্রুনোর মত দার্শনিককে বাইবেল-বিরোধী কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থন করার অপরাধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় সে সময়।

* ইতিহাস খ্যাত 'ব্ল্যাক ডেথ' যখন সাড়া ইউরোপে ১৩৪৮- ১৩৪৯ এ ছড়িয়ে পড়েছিলো, গুজব ছড়ানো হয়েছিল এই বলে যে, ইহুদীরা কুয়ার জল কিছু মিশিয়ে বিষাক্ত করে দেয়ায় এমনটি ঘটছে। বহু ইহুদীকে এ সময় সন্দেহের বশে জবাই করে হত্যা করা হয়। জার্মানীতে পোড়ানো দেহগুলোকে স্তুপ করে মদের বড় বড় বাক্সে ভরে ফেলা হয় এবং রাইন নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। উত্তর জার্মানীতে ইহুদীদের ছোট্ট কুঠুরীতে গাদাগাদি করে রাখা হয় যেন তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়, কখনোবা তাদের পিঠে চাবুক কষা হয়। থারিঞ্জিয়ার যুবরাজ জনসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, তিনি তার ইহুদী ভৃত্যকে ঈশ্বরের নামে হত্যা করেছেন; অন্যদেরকেও তিনি একই কাজে উৎসাহিত করেন।

* তের শতকে এজটেক সভ্যতা যখন বিস্তার লাভ করেছিলো, নরবলি প্রথার বিভৎসতার তখন স্বর্ণযুগ। প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার লোককে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হত। তাদের সূর্যদেবের নাকি দৈনিক 'পুষ্টি'র জন্য মানব রক্তের খুব দরকার পড়তো। বন্দিদের কখনো শিরোচ্ছেদ করা হত, এমনকি কোন কোন অনুষ্ঠানে তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ভক্ষণ করা হত। কখনোবা পুড়িয়ে মারা হত, কিংবা উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেয়া হত। বর্নিত আছে, তাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এক অক্ষতযোনী কুমারীকে দিয়ে ২৪ ঘন্টা ধরে নাচানো হয়, তারপর তার গায়ের চামড়া তুলে ফেলে ফেলে পুরোহিত তা পরিধান করেন, তারপর আরো ২৪ ঘন্টা ধরে নাচতে থাকেন। রাজা আহুইতজোলের রাজাভিষেকে আশি হাজার বন্দিকে শিরোচ্ছেদ করে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা হয়।

* ১৪০০ সালের দিকে ধর্মদ্রোহীদের থেকে চাচের দৃষ্টি চলে যায় উইচক্রাফটের দিকে। চাচের নির্দেশে হাজার হাজার রমনীকে 'ডাইনী' সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারা শুরু হয়। এই ডাইনী পোড়ানো র রীতি এক ডজনেরও বেশি দেশে একেবারে গণহিস্টেরিয়ায় রূপ নেয়। সে সময় কতজনকে এরকম ডাইনী বানিয়ে পোড়ানো হয়েছে? সংখ্যাটা এক লক্ষ থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ ছড়িয়ে যেতে পারে। ঠগ বাছতে গা উজাড়ের মতই ডাইনী বাছতে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেয়া হয়েছে। সতের শতকের প্রথমার্ধে অ্যালজাস (অষংধপব) নামের ফরাসি প্রদেশে ৫০০০ ডাইনীকে হত্যা করা হয়, ব্যাম্বাগের ব্যাভারিয়ান নগরীতে ৯০০ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। ডাইনী পোড়ানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ধর্মীয় উন্মত্ততা সে সময় অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দেয়।

* সংখ্যালঘু প্রোটেস্টেন্ট হুগেনটস ১৫০০ সালের দিকে ফ্রান্সের ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের দ্বারা নির্মম নিপীড়নের শিকার হয়। ১৫৭২ সালে সেন্ট বার্থোলোমিও দিবসে ক্যাথেরিন দ্য মেদিসিস গোপনে তাদের ক্যাথলিক সৈন্য হুগেনটসের বসতিতে প্রেরণ করে আক্ষরিক অর্থেই তাদের কচুকাটা করে। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে এই হত্যা যজ্ঞ চলতে থাকে আর এতে প্রাণ হারায় অন্ততঃ দশ হাজার হুগেনটস। হুগেনটসদের উপর সংখ্যাগুরু খ্রীষ্টানদের আক্রোস পরবর্তী দুই শতক ধরে অব্যাহত থাকে। ১৫৬৫ সালের দিকে একটি ঘটনায় হুগেনটসের একটি দল ফ্লোরিডা পালিয়ে যাবার সময় স্প্যানিস বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে - তাদের এলাকার সবাইকে ধরে ধরে হত্যা করা হয়।

* আবার ওদিকে পনর শতকে ভারতে কালিভক্ত কাপালিকের দল মা কালীকে তুষ্ট করতে গিয়ে অন্যদের শ্বাসরোধ আর জবাই করে হত্যা করত। এই কুৎসিৎ রীতির বলি হয়ে প্রাণ হারায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এখনও কিছু মন্দিরে বলি দেওয়ার রীতি চালু আছে - তবে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গ্যাড়াকলে পড়ে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা আর আগের মত মানুষকে বলি দিতে পারে না - সেই ঝাল ঝাড়া হয় নিরীহ পাঠার উপর দিয়ে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েই আধুনিক যুগে এ ভাবে রক্তলোলুপ মা কালিকে তুষ্ট রাখা হয়।

* ১৫৮৩ সালে ভিয়েনায় ১৬ বছরের একটা মেয়ের পেট ব্যাথা শুরু হলে যীশুভক্তের দল তার উপর আট সপ্তাহ ধরে এক্সরসিজম বা ওঝাগিরি শুরু করে। এই যীশুভক্ত পাদ্রীর দল ঘোষণা করেন যে, তারা মেয়েটির দেহ থেকে ১২,৬৫২ টা শয়তান তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। পাদ্রীর দল ঘোষণা করে যে, মেয়েটির দাদী কাঁচের জারে মাছির অবয়বে শয়তান পুষতেন। সেই শয়তানের কারনেই মেয়েটার পেটে ব্যাথা হত। দাদীকে ধরে নির্যাতন করতে করতে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় যে দাদী আসলে ডাইনী, শয়তানের সাথে নিয়মিত 'সেক্স' করেন তিনি। অতঃপর দাদীকে ডাইনী হিসেবে সাব্যস্ত করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এটি তিন শতক ধরে ডাইনী পোড়ানোর নামে যে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে পোড়ানো হয়েছিল, তার সামান্য একটি নমুনামাত্র।

* এনাব্যাপ্টিস্টরা এক সময় ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টেন্ট অথোরিটিদের দ্বারা স্রেফ কচুকাটা হয়েছিলেন। জার্মানির মুন্সটারে এনাব্যাপ্টিস্টরা এক সময় শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় আর 'নতুন জিয়ন' প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। ওদিকে আবার পাদ্রী মোল্লারা এনাব্যাপ্টিস্টদের বিরুদ্ধে সসস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলে এবং শহরেরে পতনের পর এনাব্যাপ্টিস্ট নেতাদের হত্যা করে চাচ্রের চূড়ায় লটকে রাখা হয়।

* প্রটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাকথলিকদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৬১৮ সালে শুরু হয়ে ত্রিশ বছর যাবৎ চলে। এ সময় পুরো মধ্য ইউরোপ পরিণত হয়েছিল বধ্য ভূমিতে। জাম্মানীর জনসংখ্যা ১৮ মিলিয়ন থেকে ৪ মিলিয়নে নেমে আসে। আরেকটি হিসেব মতে, জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ ভাগ (এবং পুরুষদের পঞ্চাশ ভাগ) এ সময় নিহত হয়েছিলো।

* ইসলামের জিহাদের নামে গত বার শতক ধরে সাড়া পৃথিবীতে মিলিয়নের ওপর মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম বছরগুলোতে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুতগতিতে পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম মরোক্ক পর্যন্ত আগ্রাসন চালায়। শুধু বিবর্মীদেরি হত্যা করেনি, নিজেদের মধ্যেও কোন্দল করে নানা দল উপদল তৈরি করেছিল। কারিজিরা যুদ্ধ শুরু করেছিলো সুন্নিদের বিরুদ্ধে। আজারিকিরা অন্য সকল 'পাপীদের' মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো। ১৮০৪ সালে উসমান দান ফোডিও, সুদানের পবিত্র সত্ত্বা, গোবির সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। ১৮৫০ সালে আরেক সুদানীয় সুফি উমর-আল হজ্জ প্যাগান আফ্রিকান গোত্রের উপরে নৃশংস বব্বরতা চালায় - গনহত্যা এবং শিরোচ্ছেদ করে ৩০০ জন বন্দির উপর। ১৯৮০ সালে তৃতীয় সুদানীয় 'হলি ম্যান' মুহাম্মদ আহমেদ জিহাদ চালিয়ে ১০,০০০ মিশরীয় লোকজন হত্যা করে।

* ১৮০১ সালে রোমানিয়ার পাদ্রীরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে ১২৮ জন ইহুদীকে হত্যা করে।

* ভারতে ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ৮১৩৫ নারীকে সতীদাহের নামে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় (প্রতিবছর হত্যা করা হয় গড়পরতা ৫০৭ থেকে ৫৬৭ জনকে)।

* ১৮৪৪ সালে পার্শিয়ায় বাহাই ধর্মপ্রচার শুরু হলে কট্টরপন্থি ইসলামিস্টরা এদের উপর চড়াও হয়। বাহাই ধর্মের প্রবর্তককে বন্দি এবং শেষপর্যন্ত হত্যা করা হয়। দুই বছরের মধ্যে সেখানকার মৌলবাদী সরকার ২০,০০০ বাহাইকে হত্যা করে। তেহেরানের রাস্তাঘাট আক্ষরিক অর্থেই রক্তের বন্যায় ভেসে যায়।

* বার্মায় ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মানুষকে বলি দেয়ার রেওয়াজ ছিলো। যখন রাজধানী মান্দালায় সরিয়ে নেয়া হয়, তখন নগর রক্ষা করার জন্য ৫৬ জন 'নিষ্কলুষ' লোককে প্রাচীরের নীচে পুতে ফেলা হয়। রাজ জ্যোতিষীরা ফতোয়া দেয় যে নগর বাঁচাতে হলে আরো ৫০০ জন নারী, পুরুষ এবং শিশুকে বলি দিতে হবে। সেই ফতোয়া অনুযায়ী বলি দেয়া শুরু হয় এবং ১০০ জনকে বলি দেয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে সেই বলিপ্রথা রদ করা হয়।

* ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে এনফিল্ড রাইফেলের কার্ট্রিজ, যেটাতে শুয়োর আর গরুর চর্বি লাগানো ছিলো বলে গুজব রটানো হয়, তাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয় এবং নির্বিচারে বহু লোককে হত্যা করা হয়।

* ১৯০০ সালে তুর্কী মুসলিমেরা খ্রীষ্টান আর্মেনিয়ানদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।

* ১৯২০ সালে ক্রিস্টেরো যুদ্ধে ৯০ হাজার মেক্সিকান মৃত্যুবরণ করে।

* ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় প্রায় ১ মিলিয়ন লোক মারা যায়। এমনকি 'মহাত্মা' গান্ধীও দাঙ্গা রোধ করতে সফল হননি, এবং তাকেও অঘোরে হিন্দু ফ্যানাটিক নথুরাম গডসের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

* ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে খ্রীস্টান,এনিমিস্ট এবং মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ৫০০,০০০ লোক মারা যায়।

* ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পুর্বপাকিস্তানের বাঙ্গালীদের উপর গণহত্যা চালায়, নয় মাসে তারা প্রায় ৩ মিলিয়ন লোককে হত্যা করে, ধর্ষণ করে ২ লক্ষ নারীকে। যদিও এই যুদ্ধের পেছনে মদদ ছিলো রাজোনৈতিক, তারপরেও ধর্মীয় ব্যাপারটিও উপেক্ষনীয় নয়। পশ্চিমপাকিস্তানীদের বরাবরই অভিযোগ ছিলো যে, পূর্ব পকাস্ত ানীরা 'ভাল মুসলমান' নয়, এবং তারা ভারতের দালাল।

* ১৯৭৮ সালে গায়ানার জোন্সটাউনে রেভারেণ্ড জিম জোন্স সেখানে ভ্রমণরত কংগ্রেসম্যান এবং তিনজন সাংবাদিককে হত্যার পর ৯০০ জনকে নিয়ে আত্মহত্যা করে, যা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেয়।

* ইসলামী আইন মোতাবেক চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সুদানে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে প্রায় ৬৬ জনকে ধরে প্রকাশ্যে হাত কেটে ফেলা হয়। মডারেট মুসলিম নেতা মোহাম্মদ তাহাকে ফাঁসিতে লটকে মেরা ফেলা হয় -কারণ তিনি হাত কেটে ফেলার মত বব্বরতার প্রতিবাদ করেছিলেন।

* সৌদি আরবে ১৯৭৭ সালে কিশোরী প্রিন্সেস এবং তার প্রেমিককে 'ব্যাভিচারের' অপরাধে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানে ১৯৮৭ সালে এক কাঠুরিয়ার মেয়েকে 'জেনা' করার অপরাধে পাথর ছুড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়।

১৯৮৪ সালে আরব আমীরাতে একটি বাড়ির গৃহভৃত্য এবং দাসীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়, অবৈধ মেলামেশার অপরাধে।

* নাইজেরিয়ায় ১৯৮২ সালে মাল্লাম মারোয়ার ফ্যানাটিক অনুসারীরা প্রতিপক্ষের শতাধিক লোকজনকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে হত্যা করে, আর তাদের রক্তপান করে।

* ১৯৮৩ সালে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথোলিক সন্ত্রাসীরা প্রোটেস্টেন্ট চার্চে ঢুকে গোলাগুলি করে প্রোটেস্টেন্ট অনুসারীদের হত্যা করে। দাঙ্গায় প্রায় ২৬০০ লোক মারা যায়।

* হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ভারতে নিত্য নৈমন্তিক ব্যাপার। ১৯৮৩ সালে আসামে এরকম একটি দাঙ্গায় ৩,০০০ জন মানুষ মারা যায়। ১৯৮৪ সালে এক হিন্দু নেতার ছবিতে কোন এক মুসলিম জুতার মালা পরিয়ে দিলে এ নিয়ে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়, সেই দাঙ্গায় ২১৬ জন মারা যায়, ৭৫৬ জন আহত হয়, আর ১৩,০০০ উদ্বাস্তু হয়। কারাবন্দী হয় ৪১০০ জন।

* লেবাননে ১৯৭৫ সালের পর থেকে সুইসাইড বোম্বিং সহ নানা সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় ১৩০,০০০ জন লোক মারা গেছে।

* ইরানের মৌলবাদী শিয়া সরকার ঘোষণা করে যে সমস্ত বাহাই ধর্মান্তরিত না হবে, তাদের হত্যা করা হবে। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে প্রায় ২০০ জন 'গোঁয়ার' বাহাইকে হত্য করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ বাহাই দেশ ছেড়ে পালায়।

* শ্রীলঙ্কা বিগত শতকের আশি আর নব্বইয়ের দশকে বৌদ্ধ সিংহলী আর হিন্দু তামিলদের লড়াইয়ে আক্ষরিক অর্থেই নরকে পরিণত হয়। সহিংসতার পেছনে কারণ বহুলাংশেই ভুরাজনৈতিক হলেও প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় মদদ অস্বীকার করা যায় না।

* ১৯৮৩ সালে জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতা মুফতি শেখ সাদ ই-দীন এল আলামী ফতোয়া দেন এই বলে যে, কেউ যদি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আজাদকে হত্যা করতে পারে, তবে তার বেহেস্ত নিশ্চিত।

* ভারতে আশির দশকে শিখ জনগোষ্ঠি নিজেদের জন্য পাঞ্জাব এলাকায় আলাদা ধর্মীয় রাজ্য 'খালিস্তান' (Land of the Pure) তৈরির পায়তারা করে আর এর নেতৃত্ব দেয় শিখ চরমপন্থি নেতা জারনাইন ভিন্দ্রানওয়ালা, যিনি তার অনুসারীদের শিখিয়েছিলেন যে, প্রতিপক্ষকে 'নরকে পাঠানো' তাদের পবিত্র দায়িত্ব। চোরাগোপ্তাভাবে পুরো আশির দশক জুড়েই বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়।

* ১৯৮৪ সালে শিখ দেহরক্ষীদের হাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলে সাড়া ভারত জুড়ে শিখদের উপর বীভৎস তাণ্ডবলীলা চালানো হয়।তিন দিনের মধ্যে ৫০০০ শিখকে হত্যা করা হয়। শিখদের বাসা থেকে উঠিয়ে, বাস থেকে নামিয়ে, দকান থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়, কখনো জীবন্ত পুড়িয়ে দেয়া হয়।

* ১৯৮৯ সালে 'স্যাটানিক ভার্সেস' নামের উপন্যাস লেখার দায়ে সালমান রুশদিকে ফতোয়া দেয়া হয় ইরাণের ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনীর পক্ষ থেকে। বইটি না পড়েই মুসলিম বিশ্বে রাতারাতি শুরু হয় জ্বালাও পোড়াও তাণ্ডব। ইসলামকে অবমাননা করে লেখার দায়ে এর আগেও মনসুর আল হাল্লাজ, আলী দাস্তি, আজিজ নেসিন, উইলিয়াম নেগার্ড, নাগিব মাহফুজ,তসলিমা নাসরিণ,ইউনুস শায়িখ, রবার্ট হুসেইন, হুমায়ুন আজাদ, আয়ান আরসি আলী সহ অনেকেই মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছেন। এদের মধ্যে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে, কেউ বা হয়েছেন পলাতক।

* ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর রামজন্মভূমি মিথকে কেন্দ্র করে হিন্দু উগ্রপন্থিরা শত বছরের পুরোন বাবড়ি মসজিদ ধ্বংস করে। এর ফলশ্রুতিতে দাঙ্গায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, এর প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও।

* ১৯৯৭ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বগ্রের দ্বার (Heaven's Gate) নামে এক 'ইউএফও' ধর্মীয় সংগঠনের ৩৯ জন সদস্য একযোগে আত্মহত্যা করে, জীবনের 'পরবর্তী' স্তরে যাবার লক্ষ্যে।

* বাংলাদেশে ১৯৪১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিলো শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের অব্যবহিত পরে তা শতকরা ২২ ভাগে এসে দাঁড়ায়। এরপর থেকেই সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় দেশটিতে ক্রমশঃ হিন্দুদের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৬১ সালে ১৮.৫% , ১৯৭৪ সালে কমে দাঁড়ায় ১৩.৫%, ১৯৮১ সালে ১২.১%, এবং ১৯৯১ সালে ১০% এ এসে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে হিন্দুদের শতকরা হার কমে ৮ ভগের নীচে নেমে এসেছে বলে অনুমিত হয়।

* ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারের উপর আল কায়দা আত্মঘাতী বিমান হামলা চালায়, এই হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ে, মারা যায় ৩০০০ আমেরিকান নাগরিক। এই ভয়াবহ ঘটনা সাড়া বিশ্বের গতিপ্রকৃতিকে বদলে দেয় ।

* ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে দাঙ্গায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, উদ্বাস্তু হয় প্রায় ১৫০,০০০ মানুষ । নারী নির্যাতন প্রকট আকার ধারণ করে। বহু মুসলিম কিশোরী এবং নারীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।

* ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশে বিএনপি-জামাত বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বেছে বেছে হিন্দুবাড়ীগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। পূর্ণিমা রানীর মত বহু কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার প্রথম ৯২ দিনের মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের ঘটনা, এবং পরবর্তী তিনমাসে প্রায় ১০০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ ছিলো হিন্দু কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

* বিএনপি জামাত কোয়ালিয়েশন সরকারের সময় বাংলা ভাই এর নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতার (JMJ) উত্থান ঘটে। তারা পুলিশের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একটি ঘটনায় একজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে গাছের সাথে উলটো করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি' বলে মিথ্যা প্রচারনা চালানো হয়।

* ২০০৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রথাভাঙ্গা লেখক হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা চালায় মৌলবাদী জে.এম.বি। চাপাতি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলা হয় তার দেহ, যা পরে তাকে প্রলম্বিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

* ২০০৪ সালের ২রা নভেম্বর চিত্র পরিচালক থিও ভ্যান গগকে প্রকাশ্যে রাস্তায় গুলি এবং ছুরিকাহত করে হত্যা করে মুসলিম সন্ত্রাসী মোহাম্মদ রোয়েরি। 'সাবমিশন নামের দশ মিনিটের একটি 'ইসলাম বিরোধী' চলচিত্র বানানোর দায়ে তাকে নেদারল্যান্ডসের রাস্তায় প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। একই ছবির সাথে জড়িত থাকার কারণে নারীবাদী লেখিকা আয়ান হারসি আলীকেও মৃত্যু পরোয়ানা দেয়া হয়।

* ২০০৫ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর জেলেণ্ডস পোস্টেন নামের একটি ডেনিশ পত্রিকা মহানবী হযরত মুহম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ১২টি কার্টুন প্রকাশ করলে সাড়া মুসলিম বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জ্বালাও-পোড়াও তাণ্ডব শুরু হয়। পাকিস্তানের এক ইমাম কার্টুনিস্টের মাথার দাম ধার্য করে এক মিলিয়ন ডলার। সিরিয়া, লেবানন, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদশ সহ সারা পৃথিবীতে সহিংসতায় মারা যায় শতাধিক লোক। ব্রিটেনের

মুসলিমেরা ব্যানার নিয়ে মিছিল করে - 'ঝষধু ঃযড়ংব যিড় রহংঁষঃ ওংষধস', 'ইঁঃপযবৎ ঃযড়ংব যিড় সড়পশ রংষধস' এবং 'ইবযবধফ ঃযড়ংব যিড় ংধু ওংষধস রং ধ ারড়ষবহঃ ৎবষরমরড়হ' ইত্যাদি । এ ধরনের শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার গুলো তথাকথিত 'শান্তির ধর্ম' ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বের কাছে উন্মোচিত করে দেয় ।

* ১৯৯৩ থেকে আজ পর্যন্ত 'আর্মি অব গড' সহ অন্যান্য গর্ভপাত বিরোধী খ্রিস্টান মৌলবাদীরা আট জন ডাক্তারকে হত্যা করেছে । এই ধরণের নৃশংসতার সর্বশেষ নিদর্শন ২০০৯ সালে খ্রিস্টান মৌলবাদী স্কট রোডার কর্তৃক ডঃ জর্জ ট্রিলারকে হত্যা । ন্যাশনাল এবরশন ফেডারেশনের সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের পর থেকে আমেরিকা এবং ক্যানাডায় গর্ভপাতের সাথে জড়িত চিকিৎসকদের মধ্যে ১৭ জনকে হত্যার প্রচেষ্টা চলানো হয়, ৩৮৩ জনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়, ১৫৩ জনের উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটে ।

* বাংলাদেশে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সামান্য 'মোহাম্মদ বিড়াল' নিয়ে কৌতুকের জের হিসেবে ২১ বছর বয়সী কার্টুনিস্ট আরিফকে জেলে ঢোকানো হয়, বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে প্রথম আলোর সম্পাদকের ক্ষমা প্রার্থনার নাটক প্রদর্শিত হয় ।

* আওয়ামিলীগ সরকারের আমলে ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার অযুহাতে ফেসবুক বন্ধ করে দেয়ার ব্যর্থ অপচেষ্টা, ইত্যাদি ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরের তালিকাটি কেবল বিগত কয়েক শতকের কতিপয় ধর্মীয় সহিংসতার আলোকচ্ছটামাত্র, সিন্ধুর বুকে বিন্দুসম । ধর্মীয় সহিংসতার পুরো ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে তা নিঃসন্দেহে মহাভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে ।অন্ধবিশ্বাস নামক ভাইরাসগুলো আমি একবার একটা লেখা লিখেছিলাম 'ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?' শিরোনামে । সেখানে দেখিয়েছিলাম, ধর্মগ্রন্থের ভাল ভাল বানীগুলো থেকে ভালমানুষ হবার অনুপ্রেরণা পায় কেউ, আবার সন্ত্রাসবাদীরা একই ধর্মগ্রন্থের ভায়োলেন্ট ভার্সগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পায় সন্ত্রাসী হবার । সেজন্যই তো ধর্মগ্রন্থগুলো-একেকটি ট্রোজান হর্স- ছদ্মবেশী ভাইরাস! এই জন্যই একই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ইহুদী নাসারাদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'বিন লাদেন' হয়ে যায়, আবার কেউ বা পরিণত হয় সুফী সাধকে । কি করে হলফ করে বলা যাবে যে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া নীচের ভাইরাসরূপী আয়াতগুলো সত্যই জিহাদী সৈনিকদের সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করছে না ? পবিত্র কোরান থেকে উদ্ধৃত করা যাক-

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে (কোরান ২: ২২১৬) ।

আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন (কোরান ৪ : ৮৪) ।

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না; তারা একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না (কোরান ৫: ৫১) ।

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত (কোরান ৩:৮৫) ।

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় (কোরান ৮:৩৯) ।

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে (কোরান ৯:২৯)।

অত:পর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দার মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অত:পর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না (কোরান ৪৭:৪)।

অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অত:পর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না (কোরান ৪:৮৯)।

আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে (কোরান ২:১৯১)

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় (কোরান ২:১৯৩)।

আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায় (কোরান ৮:১২)।

অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক (কোরান ৯:৫)।

যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন (কোরান ৯:৩৯) ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, কোরাণ কখনো সন্ত্রাসবাদে কাউকে উৎসাহিত করে না, কাউকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্ররোচিত করে না, ইত্যাদি। এটা সত্যি সরাসরি হয়ত কোরানে বুকে পেটে বোমা বেধে কারো উপরে হামলে পড়ার কথা নেই; কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, কোরাণ খুললেই পাওয়া যায় যে - যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না (৪৭:৪), কোরাণে বলা হয়েছে - আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না (৩:১৬৯); কিংবা বলা হয়েছে- যদি আল্লাহর পথে কেউ যুদ্ধ করে মারা যায় তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত (৯:১১১)।

আর আল্লাহর পথে শহীদদের জন্য জান্নাতের পুরস্কার কেমন হবে? আল্লাহ কিন্তু এ ব্যাপারে খুব পরিস্কার-

তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগন, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি (কোরান ৫৫:৫৬)।

তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ, যেন তারা সুরক্ষিত ডিম (৩৭:৪৮-৪৯); সুশুভ্র (রিহব) যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু (কোরান ৩৭: ৪৬)।

আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব (কোরান ৫২:২)

তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ (৫৫:৭২); প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ (কোরান ৫৫:-৫৮)।

উদ্যান, আঙুগুর, পূর্ণযৌবনা (ভঁষষ-নৎবধংঃবফ) তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র (কোরান ৭৮: ৩৩-৩৪)।

তথায় থাকবে আনতনয়না হুরীগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, (কোরান ৫৬: ২২-২৩)।

আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, অত:পর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী (কোরান ৫৬:৩৫-৩)।

শুধু আয়তলোচনা চিরকুমারীদের লোভ দেখিয়েই আল্লাহ ক্ষান্ত হননি, ব্যবস্থা রেখেছেন গেলমানদেরও -

সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের খেদমতে ঘুরাফেরা করবে (কোরান ৫২:২৪)। ইত্যাদি।

বেহেস্তে সুরা-সাকী-হুর-পরীর এমন অফুরন্ত ভান্ডারের গ্রাফিক বর্ণনা দেখে দেখে অনেকেরই শহীদ হতে মন চাবে! বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানী সাতোসি কানাজাওয়া তো মনেই করেন ইসলামী সমাজে বহুগামীত্ব এবং পাশাপাশি মৃত্যুর পরে উদ্ভিন্নযৌবনা এবং চিরকুমারী হুরীদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের নিশ্চয়তার কারণেই মুসলিমদের মধ্যে আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীদের এতো আধিক্য চোখে পড়ে[২৩]।এ যদি বিশ্বাসের ভাইরাসের সার্থক উদাহরণ না হয়, তবে আর 'ভাইরাস' বলব কাকে, বলুন?

কেবল ইসলামের জিহাদী সৈনিকেরাই ভাইরাস আক্রান্ত মননের উদাহরণ ভাবলে ভুল হবে। 'বিশ্বাসের ভাইরাস' লেখাটি মুক্তমনায় প্রকাশের পর দিগন্ত সরকার 'বিশ্বাসের ভাইরাস এবং আনুষঙ্গিক' নামের একটি সম্পূরক প্রবন্ধে ভারতের আর এস এস পরিচালিত স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচীর নানা উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন কিভাবে ছেলেপিলেদের মধ্যে শৈশবেই ভাইরাসের বীজ বপন করা হয়[২৪]। বিদ্যা ভারতী নামের এই স্কুল সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে - সংখ্যায় প্রায় ২০,০০০। প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী এতে পড়াশোনা করে - যাদের অধিকাংশই গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। পড়াশোনা চলে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি। তিস্তা সেতালবাদের প্রবন্ধ In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India থেকে[২৫] অসংখ্য দৃষ্টান্ত হাজির করে দিগন্ত দেখিয়েছেন কিভাবে সত্য-মিথ্যের মিশেল দেওয়া ইতিহাস পড়িয়ে এদের মগজ ধোলাই করা হয়-

"হোমার বাল্মীকির রামায়ণের একটা ভাবানুবাদ করেছিলেন - যার নাম ইলিয়াড।"

"প্লেটো ও হেরোডোটাসের মতে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ভারতীয় ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।"

"গরু আমাদের সকলের মাতৃস্থানীয়, গরুর শরীরে ভগবান বিরাজ করেন।"

একই স্কুলের ভারতের ম্যাপে ভারতকে দেখানো হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, তিব্বত এমনকি মায়ানমারের কিছু অংশ নিয়ে। বলা হয় অশোকের অহিংস নীতির ফলে তার সেনাবাহিনী যুদ্ধে উৎসাহ হারিয়েছিল। আলেক্সান্ডার নাকি পুরুর কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার উদগ্র রূপ আর বেশি প্রকটিত। সমগ্র ইতিহাস শিক্ষায় মুসলিমদের বিদেশী শক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে।

> "ভারতে বিদেশী মুসলিম শাসন"
>
> "ভারতে তলোয়ার ধরে ইসলামের প্রচার হয়েছিল। মুসলিমেরা এক হাতে কোরাণ আরেক হাতে তরবারি নিয়েই এসেছিল এদেশে, আমরা তাদের পরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আমাদের যে ভাইয়েরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েছি।"
>
> "হিন্দুরা চরম অপমানের সাথে তুর্কী শাসন মেনে নিয়েছিল।"
>
> "বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, পর্দাপ্রথা সহ আরো অনেক কুসংস্কার মুসলিম রাজত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দুসমাজে স্থান করে নিয়েছে।"
>
> "শিবাজী আর রাণা প্রতাপ ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তারা মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্যই লড়াই করেছিলেন।"

ভারতের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিন কাসিম, ঘৌরী বা গজনীর মামুদ বা তৈমুল লঙ্গ কিভাবে হিন্দুদের হত্যা করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা হাজির করে বাচ্চাদের মাথায় অঙ্কুরেই 'মুসলিম বিদ্বেষ' প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। দেশ বিভাগের জন্য একতরফা ভাবে মুসলিমদের দায়ী করে ইতিহাস লেখা হয়। আর.এস এস-এর মত সন্ত্রাসবাদী সাম্প্রদায়িক দলকে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী একটি সংগঠন হিসাবে তুলে ধরা হয়। সবথেকে মজার কথা, মহাত্মা গান্ধী যে এই সংগঠনের একজনের হাতেই মারা গিয়েছিলেন, সেকথাও বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে, পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো যাতে সবার মধ্যে ভাব সৃষ্টি হয় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের হাতে অত্যাচারিত। তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব বর্তায় তার প্রতিশোধ নেবার। এ সবকিছুই দিগন্ত তার প্রবন্ধে খুব পরিস্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন।

২০০৮ সালের ২৬ এ নভেম্বর সেইদিন প্রায় ১০ জন ফিদাইন জঙ্গী মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদের যে তুঘলকি কাণ্ড শুরু করেছিলো সেদিন এই 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নিয়ে আমরা মুক্তমনায় দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। বিশ্বাসের বাইরেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইস্যু সহ নানা ধরণের আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ উঠে এসেছিলো বিস্তৃত পরিসরে। উঠে এসেছিলো কাশ্মির প্রসঙ্গ, উঠে এসেছিলো ভারতে মুসলিম মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতি বৈষম্যের নানা উদাহরণ। এটা ঠিক যে, কাশ্মিরী জনগনের উপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাগাতার অত্যাচার, বাবড়ি মসজিদ ধবংস কিংবা গুজরাটে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিমদের উপর যে ধরণের অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছে তা ভুলে যাবার মত বিষয় নয়। মুসলিমরা ভারতের জনগনের প্রায় ১৪ শতাংশ। অথচ তারাই ভারতে সবচেয়ে নিপিরীত, অত্যাচারিত এবং আর্থসামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এক জনগোষ্ঠি। এ সমস্ত অনেক কারণ মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করেছে বছরের পর বছর ধরে। কিন্তু এটাও ঠিক, পৃথিবীতে সামাজিক অবিচার যেমন আছে, তেমন আছে সামাজিক অবিচারের নামে অন্ধবিশ্বাসের চাষ এবং তার প্রচার। ধর্মগ্রন্থের জিহাদী বানীগুলো কিংবা সুচতুর উপায়ে বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরে পরবরতী প্রজন্মকে মগজ ধোলাইয়ের উদাহরণগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান আমাদের সাইটে প্রবন্ধটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছেন তা হয়ত অনেকের মনেই চিন্তার খোরাক যোগাবে। তিনি বলেন,

> 'মানুষের কোন কোন স্বভাব যেমন উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় বিশেষ কোন বংশাণুর পরিস্ফুটনের কারণে সৃষ্ট হয়, তেমনি মৌলবাদী সন্ত্রাসও ঘটতে পারে কোন কোন ধর্মীয় আদেশাবলীর উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় পরিস্ফুটিত

হবার কারণে। এই উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে পারে অনেক কারণ, যার মধ্যে সামাজিক অনাচার অবশ্যই অন্যতম। কিন্তু 'শুধু' সামাজিক অনাচার থাকলেই যে মৌলবাদী সন্ত্রাস ঘটবে এটা নিশ্চিত না। বংশাণুর মত একটা মূল কারণও থাকতে হবে (মৌলবাদী সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে যা হতে ধর্মগ্রন্থের কোন কোন শ্লোক, কিংবা জাতিবিদ্বেষী বিকৃত ইতিহাস চর্চা)। আর এই ধর্মীয় বংশাণু কেবল সামাজিক অনাচারেই পরিস্ফুটিত হয় - তাও হলফ করে বলা যাবে না। কোন কোন ধর্মের আদেশাবলী এতই শক্তিশালী যে বিভিন্ন পরিস্ফুটক পরিবেশ অতি সহজেই সৃষ্ট হয় আদেশাবলীর জোরাল তাগিদেই। আর ধর্মীয় মূল কারণ না থাকলে সামাজিক অনাচার অন্যরকম সন্ত্রাসের জন্ম দিতে পারে। আবার নাও দিতে পারে। থাইল্যান্ডে অতি গরীব বৌদ্ধরা ভিক্ষা করবে কিন্তু কখন ও হিংসায় লিপ্ত হবে না। অনেক গরীব লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সততা বিসর্জন দেয় না। তিব্বতীদের ওপর অত্যাচার হয়েছে অনেক বেশী। কিন্তু তিব্বতের লোকেরা হিংসার আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসবাদি হয় নি। কাজেই এটা কখনই বলা যায় না যে সামাজিক অনাচারই ধর্মীয় সন্ত্রাসের মূল কারণ, বরং বলা যায় অনুঘটক মাত্র'।

বিশ্বাস ও দারিদ্র্য

বিশ্বাস শুধু মানসিক ভাবেই ব্যক্তিকে পঙ্গু এবং ভাইরাস আক্রান্ত করে ফেলে না, পাশাপাশি এর সার্বিক প্রভাব পড়ে একটি দেশের অর্থনীতিতেও। সাম্প্রতিক বহু গবেষণায়ই বেরিয়ে এসেছে যে দারিদ্র্যের সাথে ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত (অগাস্ট, ২০১০) গ্যালোপ জরিপ থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক[৩১]। আপনার বিশ্বাস প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কোন প্রভাব ফেলে কিনা, এর ভিত্তিতে ২০০৯ সালে যে জরিপ চালানো হয়, তাতে দেখা যায় পৃথিবীর সর্বাধিক দারিদ্র্যকিষ্ট দেশগুলো থেকেই 'হ্যা বাচক' উত্তর উঠে এসেছে। আর তালিকাতে প্রথমেই আছে বাংলাদেশের নাম।

Is religion an important part of your daily life?

	Yes
Bangladesh	99%+
Niger	99%+
Yemen	99%
Indonesia	99%
Malawi	99%
Sri Lanka	99%
Somaliland region	98%
Djibouti	98%
Mauritania	98%
Burundi	98%

2009

GALLUP

চিত্রঃ গ্যালোপ জরিপ থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক

সম্প্রতি উপরের এই গ্যালোপ জরিপের উপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশ্লেষণমূলক একটি সম্পাদকীয় প্রাকশিত হয়েছে[৩২]। কলামিস্ট চার্লস ব্লো সম্পাদকীয়টিতে বলেন,

> একশতটি দেশের মধ্যে ২০০৯ সালে গ্যালোপ জরিপ চালানো হয়েছে এবং দেখা গেছে দারিদ্র্যের সাথে ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ধনী দেশগুলো কম ধর্মপ্রবণ, আর দরিদ্র দেশগুলোতেই ধর্মান্মোদনা বেশি দৃশ্যমান'।

নিউইয়র্ক টাইমসের উক্ত প্রবন্ধটিতে চমৎকার একটি গ্রাফও সংযুক্ত হয়েছে, যেটি নিজেই দারিদ্র্যের সাথে ধর্মবিশ্বাসের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট -

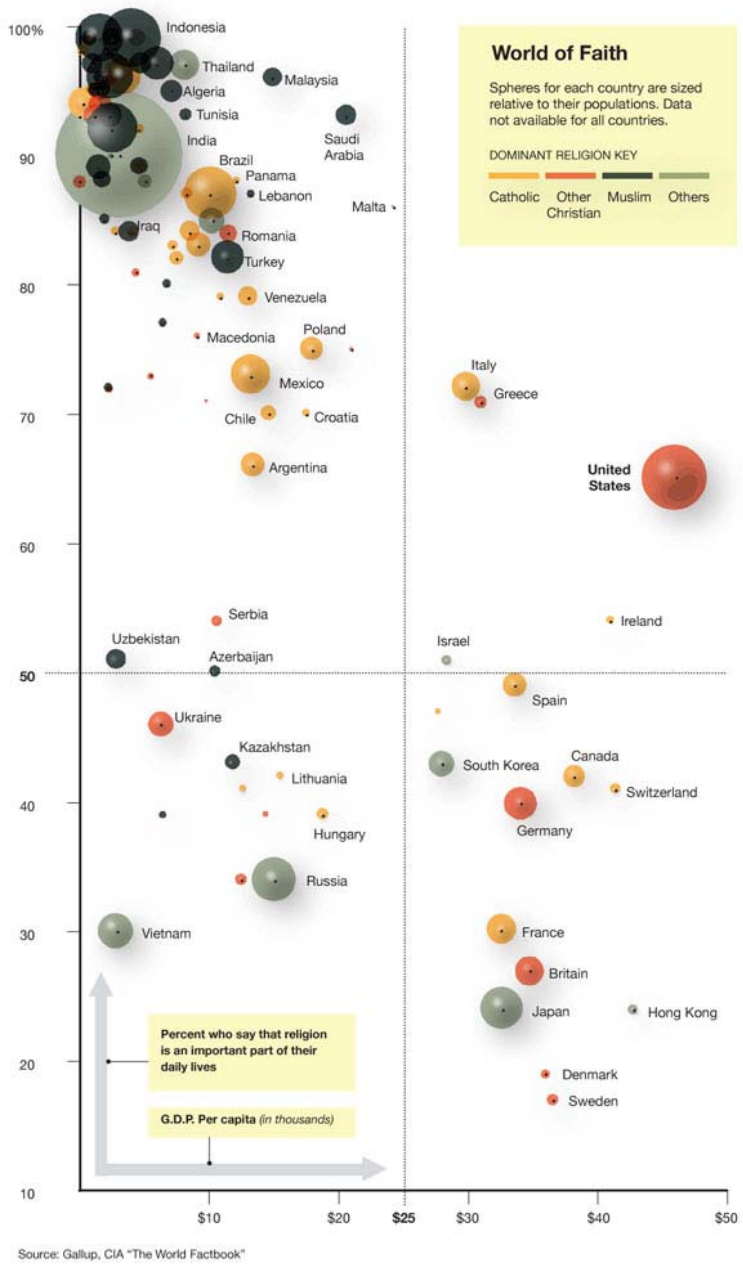

চিত্রঃ গ্যালোপ জরিপের উপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশ্লেষণমূলক একটি সম্পাদকীয় প্রাকশিত হয়

উপরে গ্রাফের গড়পরতা পয়েন্টগুলোর ট্রেণ্ড বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে। যদি কেউ কোন দেশের ধর্মীয় প্রভাব এবং পার ক্যাপিটা গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্টের প্লট একটি বক্ররেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন তবে রেখচিত্রটি দাঁড়াবে অনেকটা এরকম -

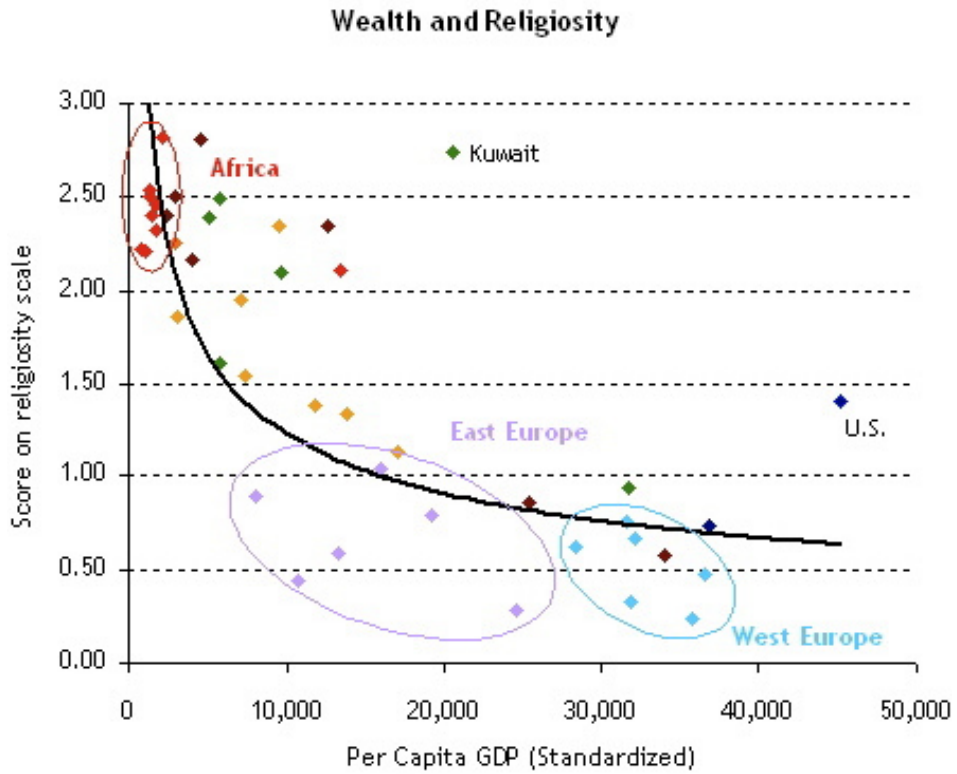

চিত্রঃ দেশের ধর্মীয় প্রভাব বনাম পার ক্যাপিটা জিডিপির প্লট

এই গ্রাফটি নিয়ে আমরা মুক্তমনা ব্লগে অনেক আলোচনা করেছি। এটি অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গরের 'নিউ এথিজম' বইয়ে আছে; ইন্টারনেটেও অনেক সাইটে গ্রাফটি পাওয়া যাবে[৩৩]।

গ্রাফটি লক্ষ্য করলেই পাঠকেরা দেখবেন যে, আমেরিকা এবং কুয়েতের মত দু' একটি দেশ ছাড়া বাকী সব কমবেশী দেশই এই গ্রাফের কোরিলেশন সর্মথন করে। আমেরিকা অন্যতম স্বচ্ছল দেশ (গড়পরতা জিডিপি ৮৪৬,০০০) হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত বেশি। ধনসম্পদে শীর্ষস্থানীয় দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশটির ধর্মীয় প্রভাবের পরিমাপ দারিদ্র্যক্লিষ্ট মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা কিংবা চিলির সারিতে রয়ে গেছে। কেন এই ব্যতিক্রম তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি কারণ তো অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী চেতনার বিকাশ। একটি দেশ যখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যায়, সামরিকভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠে, তখন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলো হারাতে থাকে।গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার শেষদিকেও একই ব্যাপার ঘটেছিলো। এর বাইরে, আরেকটি বড় কারণ, আমেরিকার পুঁজিবাদ ধর্ম জিনিসটাকেও আভ্যন্তরীণভাবে 'ব্যবসা'র পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। এখানে চার্চকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়, তা আসলে ধর্মীয় পরিবৃত্তির বাইরে গিয়েও সাধারন জনগনকে আকৃষ্ট করে। সধারাণ বসন্ত উৎসব (ফল ফেস্টিভাল) থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্লাসিকাল পিয়ানো বাজনার বেশিরভাগই এখানে চার্চকেন্দ্রিক। এই 'আমেরিকান এনোমালি' আর অস্বাভাবিক উপায়ে অর্জিত তেল চুকচুকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের কথা বাদ দিলে ধর্ম এবং দারিদ্র্যের একটা স্পষ্ট সম্পর্কই পাওয়া যায়। নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশ এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উত্থানের ফলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে তেলের দাম পড়ে গেলে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও এভাবে ব্যতিক্রম হিসেবে থাকবে না বলাই বাহুল্য। এই দু একটি এনোমালি তথা

'অস্বাভাবিকতা' বাদ দিলে গ্রাফ থেকে ধর্ম এবং দারিদ্র্যের একটা স্পষ্ট সম্পর্কই কিন্তু পাওয়া যায়। গ্রাফ দেখলে যে কেউ বুঝবে - যে দেশে ধর্মীয় প্রভাব যত বাড়ছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, আর ধর্মীয় প্রভাব যেখানে কম মানুষের স্বচ্ছলতাও বেশী। ব্যাপার কী?

ব্যাপার তো সাদা চোখেই বোঝা যাবার কথা। যে সমস্ত দেশ যত দারিদ্র্যক্লিষ্ট, সে সব দেশেই ধর্ম নিয়ে বেশি নর্তন-কুর্দন চলে, আর শাসকেরাও সে সব দেশে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সেজন্যই দারিদ্র্যক্লিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ধর্ম খুব বড় একটা নিয়মক হয়ে কাজ করে সবসময়েই। কিংবা ব্যাপারটা উল্টোভাবেও দেখা যেতে পারে- ধর্মকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়া, কিংবা লম্ফ ঝম্ফ করা, কিংবা জাগতিক বিষয় আশয়ের চেয়ে ধর্মকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণেই সে সমস্ত দেশগুলো প্রযুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে, এবং সর্বোপরি দরিদ্র। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকার মোল্লাদের তোয়াজে রাখতে ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছিলো। যে দেশ জাগতিক বিষয় আশয়ের চেয়ে ঠুনকো বিশ্বাস নিয়েই মত্ত থাকে, সে দেশ অর্থ বৈভব জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে যাবে - এটা কি আশা করা যায়? ধর্মের রশি আমাদের পেছনে টেনে রেখেছে অনেকটাই। বিশ্বাসের ভাইরাসের এর চেয়ে বড় কুফল আর কী হতে পারে! তাই 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' বলে কথিত বিশ্বাসীদের তোতা পাখির মত আউড়ানো বহুল প্রচারিত উক্তিটিকে সামান্য বদলে দিয়ে আমরা বলতে পারি -

বিশ্বাসে মিলায় দারিদ্র্য, অবিশ্বাসে বহুদূর!

ভাইরাস প্রতিষেধক

তাহলে এই সন্ত্রাসের ভাইরাস প্রতিরোধ করা যায় কি করে? ভাইরাস যে প্রতিরোধ করতেই হবে - এ নিয়ে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। এ ভাইরাস প্রতিরোধ না করতে পারলে এ 'সভ্যতার ক্যান্সারে' রূপ নিয়ে আমাদের সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করবে। মুম্বাইয়ে ফিদাইন হানার পর পরই মুক্তমনায় লিখিত একটি প্রবন্ধে ডঃ বিপ্লব পাল বলেছিলেন [৩৪] -

> 'রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ ইত্যাদির ধারনা গুলোর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হচ্ছে-তখন মধ্যযুগীয় ধর্মগুলির আত্মিক উন্নতির কিছু বাণী ছাড়া আর কিছুই আমাদের দেওয়ার নেই। সেই আত্মিক উন্নতির নিদান ধর্ম ছাড়াও বিজ্ঞান থেকেই পাওয়া যায়-তবুও কেও আত্মিক উন্নতির জন্য ধার্মিক হলে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু ধর্মপালন যখন তার হিন্দু বা মুসলমান পরিচয়বোধকে উস্কে দিচ্ছে-সেটা খুব ভয়ঙ্কর। ধর্ম থেকে সেই বিষটাকে আলাদা করতে না পারলে, এগুলো আমাদের সভ্যতার ক্যান্সার হয়ে আমাদের সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করবে।'।

অর্থাৎ, এ ভাইরাসকে না থামিয়ে বাড়তে দিলে একসময় সারা দেহটাকেই সে অধিকার করে ফেলবে। প্রবন্ধের প্রথম দিকে দেয়া ল্যাংসেট ফ্লুক প্যারাসাইট আক্রান্ত পিপড়ের উদাহরণের মত মানবজাতিও একসময় করে তুলবে নিজেদের আত্মঘাতী, মড়ক লেগে যাবে পুরো সমাজে। তাই কি আমরা চাই?

না, কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষই তা চাইতে পারেন না। তাহলে এই সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? এই ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য গড়ে তোলা দরকার এন্টিবডি, সহজ কথায় তৈরি করা দরকার ভাইরাস প্রতিষেধকের। আর এই সাংস্কৃতিক ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে আমারুআপনার মত বিবেকসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষেরাই। আমরা কিন্তু আসলেই মনে করি - এই এন্টিবডি তৈরি করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের মুক্তমনার মত বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী সাইটগুলো; ভুমিকা

রাখতে পারে বিশ্বাসের নিগড় থেকে বেরুনো মানবতাবাদী গ্রুপগুলো এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ব্যক্তিবর্গ। দরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার, দরকার খোলস ছেড়ে বেরুনোর মত সৎ সাহসের, দরকার আমার-আপনার সকলের সামগ্রিক সদিচ্ছার। আপনার আমার এবং সকলের আলোকিত প্রচেষ্টাতেই হয়ত আমারা একদিন সক্ষম হব সমস্ত বিশ্বাসনিভ্র 'প্যারাসাইটিক' ধ্যান ধারণাগুলোকে তাড়াতে, এগিয়ে যেতে সক্ষম হব বিশ্বাসের ভাইরাসমুক্ত নিরোগ সমাজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

ড.ডেরেল রে যে কথাগুলো বলে তার 'গড ভাইরাস' বইটি শেষ করেছেন[৩৫], সে কথাগুলো উচ্চারণ করে আমরাও সমাপ্তি টানবো এই প্রবন্ধটির -

> ভাইরাস মুক্ত জীবনের আস্বাদন কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং একটি চলমান যাত্রাপথের নাম। আমরা সবাই এই ভাইরাস দিয়ে কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত, এবং আমরা নিজেদের অজান্তেই বয়ে নিয়ে যাই অসুস্থ বিশ্বাস, মতামত কিংবা ধারণা। আমরা অনেকের মাথাই আক্রান্ত করে ফেলা হয়েছে আমাদের শিশু বয়সেই আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পানপাত্র হাতে তুলে দিয়ে। আক্রান্ত মননকে প্রতিষেধক দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ করে ফেলাই হবে আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য। আমরা যদি ঈশ্বর-ভাইরাসের কুফলগুলো সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে পারি, তবেই আমরা ভাইরাস মুক্ত সমাজ প্রত্যাশা করতে পারি।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'(২০০৫) ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (২০০৭), সমকামিতা : বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান (২০১০) গ্রন্থের লেখক। এছাড়া সাদ কামালীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন ু 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (২০০৮)নামের একটি মুক্তবুদ্ধির সংকলন। পরবর্তী প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'অবিশ্বাসের দর্শন'। লেখাটি 'অবিশ্বাসের দর্শন' (শুদ্ধস্বর, ২০১১) বইয়ের একটি উল্লেকযোগ্য অংশ। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

তথ্যসূত্র

[১] ৯-১১, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001

[২] Bruce Lincoln, Holy Terrors, : Thinking About Religion After September 11, University Of Chicago Press; 2 edition , 2006

[৩] Last words of a terrorist, Guardian UK, http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113

[৪] Is Religion Killing Us?: Violence in the Bible and the Quran, Jack Nelson-Pallmeyer, Trinity Press International, 2003

[৫] The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, W. W. Norton, 2005

[৬] Islamabad Tells of Plot by Lashkar, Islamabad: Wall Street Journal, Retrieved 2009-07-28.

[৭] অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস, ১৪ অগ্রহায়ন ১৪১৫ (নভেম্বর ২৮ঃয, ২০০৮), মুক্তমনা

[৮] Richard Dawkins, What Use is Religion?, Free Inquiry magazine, Volume 24, Number 5. বাংলা - ধর্মের উপযোগিতা, মুক্তমনা

[৯] Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking Adult, 2006

[১০] Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005

[১১] Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009

[১২] Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003

[১৩] Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 1.

[১৪] অভিজিৎ রায়, সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর, ২০১০, পৃ ১৭২ - ১৯৮

[১৫] The Selfish Gene, Richard Dawkins, Oxford University Press, 1976

[১৬] বিজ্ঞান ও ধর্ম: সংঘাত নাকি সমন্বয়? (২০০৮): মুক্তমনা ইবুক, http://www.mukto-mona.com/project/Biggan_dhormo2008/

[১৭] 'বিজ্ঞান ও ধর্ম: সংঘাত নাকি সমন্বয়' বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়দ্রঃ

[১৮] স্বাধীন, জিন এবং মিম, ১১ অগ্রহায়ন ১৪১৭ (২৫শে নভেম্বর, ২০১০), মুক্তমনা বাংলা ব্লগ

[১৯] দাদা তপন, মেমেটিক্স, ১৬ মে (রবিবার), ২০১০ ৭:৫৪ অপরাহ্ন, আমার ব্লগ ।

[২০] Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House, 2009

[২১] Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & Co; 1981

[২২] বেশ কিছু উদাহরণ নেয়া হয়েছে Holy Horrors: An Illustrated History of Religious Murder and Madness, James A. Haught, Prometheus Books, 1990 থেকে, সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং মুক্তমনা সাইট থেকে ।

[২৩] Alan S. Miller & Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade, 2008

[২৪] বিশ্বাসের ভাইরাস এবং আনুষঙ্গিক, দিগন্ত সরকার, মুক্তমনা, http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=325

[২৫] In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India, Online: http://www.sacw.net/HateEducation/Teesta.html

[২৬] Satoshi Kanazawa, Why Liberals And Atheists Are More Intelligent, Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57

[২৭] Satoshi Kanazawa, Why Liberals Are More Intelligent Than Conservatives, Psychology Today, March 21, 2010

[২৮] Satoshi Kanazawa, Why Atheists Are More Intelligent than the Religious, Psychology Today, April 11, 2010

[২৯] Jaime E. Settle, Christopher T. Dawes, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler. Friendships Moderate an Association between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology. The Journal of Politics, 2010; 72 (04): 1189

[৩০] আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশী (ইধৎহধ Research Group, 1999 study দ্রঃ); এও দেখা গিয়েছে যে, যে পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে সমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোন সদস্যদের দ্বারা বেশী যৌণ নিপীড়ন হয়। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুরে রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মত। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী । আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশী। ডেভিড উলফের মনোবিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ক গবেষনায় দেখা গেছে,অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণতা এবং ধর্মের আসক্তির কারণে মানুষ অধিকতর বেশিমাত্রায় মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক,অসামাজিক, অনমনীয় এবং কর্তৃত্বপরায়ণ হিসেবে গড়ে উঠে। এ সংক্রান্ত বেশ কিছু পরিসংখ্যান আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এ ধরণের আরো পরিসংখ্যানের সাথে পরিচিত হতে চাইলে দেখা যেতে পারে ড. মাইকেল শারমারের The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule (Times Books, ২০০৪) গ্রন্থটি।

[৩১] Religiosity Highest in World's Poorest Nations, Gallup's global reports, August 31, 2010।

[৩২] Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published: September 3, 2010

[৩৩] World Publics Welcome Global Trade — But Not Immigration, Summary of Findings, http://pewglobal.org/2007/10/04/world-publics-welcome-global-trade-but-not-immigration/

[৩৪] মুম্বাই এ ফিদাইন হানা - একটি বিশ্লেষণ, বিপ্লব পাল, মুক্তমনা online : http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=288

[৩৫] Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009

[৩৬] Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online: http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html